ইউনিট ১৬

বাংলাদেশের সংবিধান

ভূমিকা

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি। কেননা একটি রাষ্ট্রকে তার সংবিধান দ্বারা জানা যায়। রাষ্ট্রের স্বরূপ, সরকারের ধরন এবং নাগরিকের অধিকারের প্রকৃতি জানার জন্য সংবিধান পাঠ আবশ্যক। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল ৪৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এদের মধ্য থেকে ৩৪ জন সদস্য নিয়ে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালে ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল গণ-পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পেশ করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পাঠের পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ করা হয়।

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠসমূহ আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১	:	বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি।
পাঠ-২	:	বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার।
পাঠ-৩	:	বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সরকার ব্যবস্থা ও জাতীয় সংসদ।
পাঠ-৪	:	বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধন সমূহ।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি মূল দলিল। এ সংবিধানটি উৎকৃষ্ট এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. **লিখিত দলিল** : মূল সংবিধান একটি সুলিখিত দলিল। এতে ১টি প্রস্তাবনা, ৪টি তফসিল, ১১টি ভাগ এবং ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আছে।

২. **দুষ্পরিবর্তনীয়** : বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। তবে সংশোধন পদ্ধতি খুব কঠিন নয়। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব পাস করানো যায়।

৩. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি** : সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-এই চারটি মূলনীতিকে সংবিধানের মূল স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

৪. **মৌলিক অধিকার** : সংবিধানের জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সংবিধানে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৫. **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র** : সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রিয় সরকারই সব ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রিয় আইনসভাই সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা।

৬. **প্রজাতন্ত্র** : বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাঁর নামে রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

৭. **এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা** : সংবিধানে দেশের জন্য একটি এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান করা হয়। ৩০০ জন নির্বাচিত ও ১৫ জন সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ মোট ৩১৫ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে। পরবর্তীতে সংরক্ষিত মহিলা আসন বৃদ্ধি করে ৩০ জন এবং চতুর্দশ সংশোধনীতে বৃদ্ধি করে তা ৪৫ করায় বর্তমানে সংসদ সদস্য সংখ্যা ৩৪৫ জন।

৮. **সংসদীয় পদ্ধতির সরকার** : মূল সংবিধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী করে তার মন্ত্রিপরিষদকে দেশের প্রকৃত শাসক করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সকল কাজের জন্য সংসদের নিকট জবাবদিহি করবে।

৯. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** : সংবিধানে বাংলাদেশের জন্য একটি সর্বোচ্চ আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট হবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালত সংবিধানের প্রাধান্য নিশ্চিত করবে এবং তার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে।

১০. **ন্যায়পাল** : সরকারি যে কোন কর্তৃপক্ষের কাজের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সংবিধানে ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ন্যায়পাল যে কোন বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারবেন।

১১. **সাংবিধানিক প্রাধান্য** : সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে ঐসব ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান। ১৯৭২ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ১৪ বার এ সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চম সংশোধনী আদালত কর্তৃক বাতিল হওয়ায় মূল সংবিধান অনেকটাই পূর্বের বৈশিষ্ট্য ফিরে পাবে।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

ভারত এবং আয়ারল্যাণ্ডের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানেও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতগুলো মৌলিক নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নীতিগুলো রাষ্ট্র শাসনের মূলসূত্র। সরকারের কর্তব্য হলো রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োগ করা। মূল সংবিধানের 'দ্বিতীয় ভাগে' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি শিরোনামে ৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মূলনীতিগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো হল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। নিম্নে মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হলো :

ক. **জাতীয়তাবাদ** : মূল সংবিধানের ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। বাঙালি জাতির সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।" বাঙালি জাতি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ একটি আলাদা জনগোষ্ঠী। এ স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে সচেতন বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালির পথপ্রদর্শক ও অগ্রগতির প্রেরণা।

খ. **সমাজতন্ত্র** : মূল সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়ানুগ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শোষণহীন সমাজ কায়েম করা হবে।"

সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার লক্ষ্য ছিল মূলত মেহনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দেয়া। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে গণতান্ত্রিক পথে। এজন্য শ্রেণীসংগ্রাম কিংবা বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। আইনের আরোপিত সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে।

গ. **গণতন্ত্র** : সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেখানে মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং মানবসত্তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে। রাষ্ট্রীয় সকল কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে। সমাজজীবন হতে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীভূত করে নাগরিকদের মৌলিক মানবিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

ঘ. **ধর্ম নিরপেক্ষতা** : সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন ধর্মের ব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির বৈষম্য বা তার উপর উৎপীড়ন করা হবে না।"

মানুষ যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে এবং কেউ যাতে কারো ধর্ম-পালনে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সকল ধর্ম সমান। জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন, প্রচার ও অনুশীলন করতে পারে। সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মকে অস্বীকার করা নয়, ধর্মহীনতাও নয়।

এছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত ১৪, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদে সামাজিক নীতি সংক্রান্ত ২০, ২২, ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে আইন ও শাসন ব্যবস্থা নীতি সংক্রান্ত এবং ২৫ অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত মূলনীতি উল্লেখ রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা নীতি, কৃষক শ্রমিকের মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, সুযোগের সমতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য রূপে কর্ম, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় স্মৃতি ও নিদর্শন সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক নীতি ইত্যাদি নীতিসমূহকেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে সমারিক আইন বলবৎ ছিল। এ সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আদেশ, অধ্যাদেশ, ঘোষণা ও সামরিক আইন-বিধি এবং অন্যান্য আইন ও আদেশের মাধ্যমে সংবিধানের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদে 'পঞ্চম সংশোধনীর' মাধ্যমে এগুলো বৈধ করে নেওয়া হয়। এই পঞ্চম সংশোধনীতে সংবিধানের অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ−

ক. ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীতে 'সমাজতন্ত্রের' ব্যাখ্যা দেওয়া হয় 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার'।

খ. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'ধর্ম নিরপেক্ষতার' স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এ কথাগুলো সবিধানে সংযোজন করা হয়।

গ. মূল সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' শব্দটি সংবিধানে সংযোজন করা হয়।

২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্ট এক রায় প্রদান করে। আপিল বিভাগ ২০১০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কিছু পযর্বক্ষেণ ও সংশোধনের কথা বলে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অনেকটাই পূর্বের অবস্থায় চলে গিয়েছে।

সারসংক্ষেপ

১৯৭২ সনের মূল সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাতির আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনরায় পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের ফলে পুনঃস্থাপিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের গণ মানুষের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের মূল সংবিধান কার্যকর হয়−

(ক) ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর (খ) ১৯৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর

(গ) ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ (ঘ) ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ

২। বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে−

(ক) সংবিধানের চতুর্থ ভাগে (খ) সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে

(গ) সংবিধানের প্রথম ভাগে (ঘ) সংবিধানের পঞ্চম ভাগে

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো কী কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

২। সংশোধনীসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক), ২। (খ)।

পাঠ-২ : বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের বিবরণ দিতে পারবেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে সন্নিবেশিত রয়েছে। তেমনি বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল–

১। **আইনের চোখে সমতা :** সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং সকলেই আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২। **ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্যহীনতা :** ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে।

৩। **সরাকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা :** প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকদের প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের সুযোগের সমতার ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৪। **উপাধি, সম্মান ও ভূষণের বিলোপসাধন :** রাষ্ট্র কোন উপাধি, সম্মান বা ভূষণ প্রদান করবে না। তবে সাহসিকতার জন্য পুরস্কার বা একাডেমিক পুরস্কার গ্রহণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

৫। **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার :** আইনের আশ্রয় লাভ করার অধিকার বাংলাদেশের সকল নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এজন্য আইনানুযায়ী কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৬। **জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষণ :** আইনানুযায়ী জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৭। **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ :** কোন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করে আটক রাখা যাবে না।

৮। **জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ :** সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং এ বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৯। **বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ :** সংবিধানের ৩৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার গ্রেফতার কিংবা দণ্ড দেয়া যাবে না।

১০। **চলাফেরার স্বাধীনতা :** জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, এর যে কোন স্থানে বসবাস এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

১১। **সমাবেশের স্বাধীনতা :** জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

১২। **চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা :**

ক. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়,

খ. প্রত্যেক নাগরিকের বাকস্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এবং

গ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে।

১৩। **সম্পত্তির অধিকার :** আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিধি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে। আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না।

১৪। **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ :** মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের নিকট মামলা রুজ্জু করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

১৫। **ধর্মীয় স্বাধীনতা :** আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম-অবলম্বন, পালন ও বা প্রচারের অধিকার থাকবে।

১৬। **পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা :** আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ এবং ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের উপরিউক্ত মৌলিক অধিকারগুলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণে সহায়ক। ব্যক্তির নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বজায় রাখা, মানবিক জীবনকে সম্ভব করতে অনুকূল পরিবেশ ও সম্ভাবনা গড়ে তোলে। তবে সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো নিরঙ্কুশ নয়। এর উপর নানা বাধা নিষেধ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এছাড়াও জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকার খর্ব করা যায়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রণীত মৌলিক অধিকারসমূহ আইনের শাসন, নাগরিক সমতা, সুযোগের সাম্য, মানবিকতা, মৌলিক চাহিদাসমূহের পরিপূরণ, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধ, বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ এবং আধুনিক ও নিরাপদ জীবন যাপনে সহায়ক হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহের বর্ণনা রয়েছে-

(ক) ৭ থেকে ১৫ অনুচ্ছেদে (খ) ২৭ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদে

(গ) ১৭ থেকে ২২ অনুচ্ছেদে (ঘ) ৪৮ থেকে ৫৮ অনুচ্ছেদে

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের বর্ণনা দিন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ)

পাঠ-৩ : বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সরকার ব্যবস্থা ও জাতীয় সংসদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সরকার কাঠামোর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সরকার পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা, গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি গণ-প্রজাতন্ত্র (Peoples Republic)। বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। বাংলাদেশের কোন অঙ্গরাজ্য, প্রদেশ বা জেমিনিয়ন নেই। বাংলাদেশে হাইকোর্টও এককেন্দ্রিক। এর কোন শাখা নেই। সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে এদেশে ব্যক্তিগত, যৌথ (সমবায়) ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন।

রাষ্ট্রপতি (President) বাংলাদেশের শীর্ষ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি। ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স অনুযায়ীও রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। তিনি জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সাধারণ পন্থায় রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন জন্য/ইমপিচমেন্ট দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটে প্রয়োজন। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নামমাত্র শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। দেশে যুদ্ধাবস্থা বা আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতির প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বা অনুরোধ থাকতে হবে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ভারতের রাষ্ট্রপতি বা ব্রিটেনের রানীর মতো।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান। ১৮ বছর এবং তদুর্ধ বয়সের জনগণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচন করেন। এর বাইরে সংবিধানে সংরক্ষিত ৪৫টি আসনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আসনের অনুপাতে নারী সংসদ সদস্যদের মনোনীত করে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল। ফলত জাতীয় সংসদে সর্বমোট আসন ৩৪৫টি। সংসদ সদস্যদের মেয়াদকাল তথা সংসদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর। সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। অর্থাৎ বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ই পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার অন্য মন্ত্রীদের মনোনয়ন দেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে মন্ত্রীসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। দেশের শাসনভার নির্বাহী বিভাগের কাছে ন্যাস্ত। নির্বাহী বিভাগের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদকে নেতৃত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা কার্যত শাসন বিভাগের সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। তারাই সরকার পরিচালনা করেন। মন্ত্রীসভা যৌথভাবে আইন বিভাগ তথা সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সংসদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এক কক্ষ (Uni-cameral) বিশিষ্ট আইনসভা। ইণ্ডিয়া কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মতো তা দ্বিকক্ষ (Bi-cameral) বিশিষ্ট নয়। জাতীয় সংসদ পরিচালনার জন্য স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার রয়েছেন। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন ছাড়াও শাসন সংক্রান্ত কিছু কার্যাবলি সম্পাদন করে। জাতীয় সংসদ মূলত সংসদীয় কমিটি দ্বারা ক্রিয়াশীল থাকে। জাতীয় সংসদ, সসদ্যদের দুই-তৃতীয়াংশ এর সমর্থনের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। তবে সংবিধানের মৌল কাঠামো (Basic structure) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব পাস হতে হবে। আবার সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী হলে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সংশোধনী সুপ্রীম কোর্ট 'বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review)' দ্বারা বাতিল করতে

পারে। এভাবে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে কিছুটা সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জাতীয় সংসদ সংবিধান সংশোধন, সংরক্ষণ ছাড়াও যুদ্ধ ঘোষণা এবং চুক্তি অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৩৪৫টি। ৩০০ জন সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। বাকিরা মনোনীত। সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা মূলত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার ওপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি নামমাত্র শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। তবে শাসনতান্ত্রিক সমস্ত কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। সংবিধান সংশোধনের একমাত্র ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যাস্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ একটি –

(ক) গণতন্ত্র (খ) গণ-প্রজাতন্ত্র

(গ) অভিযানতন্ত্র (ঘ) শ্রমিকতন্ত্র

২। জাতীয় সংসদের সর্বমোট আসন

(ক) ৩০০ (খ) ৩৩০

(গ) ৩৪৫ (ঘ) ৩১০

৩। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

(ক) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট (খ) তিন বক্ষ বিশিষ্ট

(গ) এক কক্ষ বিশিষ্ট (ঘ) কোনটি নয়

৪। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার ধরন

(ক) সংসদীয় (খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) মিশ্র

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সরাসরি ভোটে কতজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন?

২। সংবিধান কিভাবে সংশোধন করা যায়?

৩। মন্ত্রীপরিষদ কার নিকট দায়বদ্ধ?

৪। সমস্ত কর্মকাণ্ড কার নামে সম্পাদিত হয়?

৫। চুক্তি অনুমোদন করে কে?

৬। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা কেমন?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সরকার ব্যবস্থা ও সংসদ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

১। (ক), ২। (গ), ৩। (গ), ৪। (ক)।

পাঠ-৪ : বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

সংবিধান সংশোধন প্রতিটি রাষ্ট্রেই একটি অনিবার্য বিষয়। সময়ের প্রয়োজনে সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংশোধন না করে কোন উপায় থাকে না। বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তনশীল, তবে তা দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৪টি সংশোধনী আনা হয়েছে। জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যায়। নিম্নে বাংলাদেশে এ যাবৎকাল গৃহীত সংশোধনীসমূহ আলোচনা করা হলো :

প্রথম সংশোধনী

যুদ্ধপরাধীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয়। সংবিধান কার্যকরের ৭ মাস পর ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই প্রথম সংশোধনী বিল পাস হয়। এই সংশোধন অনুযায়ী গণহত্যা কিংবা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য আইন প্রণয়নের বিধান রাখা হয়।

দ্বিতীয় সংশোধনী

এই সংশোধনীর দ্বারা দেশে 'জরুরি অবস্থা' জারির বিধান করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এটি পাস হয়। এই সংশোধনীতে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বিনা বিচারে যে কাউকে আটকের বিধান করা হয়। মূলত এ সংশোধনীর মাধ্যমে শাসন বিভাগ তথা নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় সংশোধনী

এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করে। এ হস্তান্তরের শর্ত ছিল ভারত দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় যাবার জন্য বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর প্রদান করবে। ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর জাতীয় সংসদে এ সংশোধনী পাস হয়।

চতুর্থ সংশোধনী

চতুর্থ সংশোধনী বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের বদলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। দেশে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করা হয়। যার নাম ছিল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ (বাকশাল)। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয়।

পঞ্চম সংশোধনী

এই সংশোধনীর লক্ষ্য ছিল সামরিক সরকারকে বৈধতা দান। মূলত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জারিকৃত সকল ফরমান, আদেশ ও সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়া হয় ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সংযোজন করা হয়। সংবিধানের চারটি মূলনীতিতেও পরিবর্তন আনা হয়। বাঙালি জাতীয়বাদের বদলে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে 'সর্বশক্তিমান আলাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করা হয়। এছাড়া সমাজতন্ত্রের বদলে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র' সংযোজন করা হয়।

ষষ্ঠ সংশোধনী

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যু পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলার সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী আনা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির দুটো অলাভজনক পদ বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের ১ জুলাই এই সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়।

সপ্তম সংশোধনী

সামরিক একনায়ক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ ও শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য সপ্তম সংশোধনী গৃহীত হয়। মূলত এই সংশোধনীর দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক সরকার ঘোষিত সকল ফরমান, আদেশ, অধ্যাদেশসহ সামরিক সরকারের গৃহীত যাবতীয় কর্মকাণ্ড বৈধতা পায়। ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর এ সংশোধনী গৃহীত হয়।

অষ্টম সংশোধনী

অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুরে হাইকোর্ট বিভাগের একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের বিধানটি পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্ট এক রায়ে বাতিল করে দেয়। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হয়।

নবম সংশোধনী

নবম সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের সরাসরি ভোটে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এর আগে রাষ্ট্রপতি সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে উপরাষ্ট্রপতিকে মনোনয়ন দিতেন। এ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের একই তারিখে ভোট গ্রহণের কথা বলা হয়।

দশম সংশোধনী

নারী সংসদ সদস্যদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদের ৩০টি মহিলা আসন পুনরায় সংরক্ষণের বিধান করা হয়। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হবার ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৯০ সালের ১০ জুন নবম সংশোধনী গৃহীত হয়।

একাদশ সংশোধনী

এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের স্বপদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সংশোধন অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগদানকে বৈধতা দেয়া হয়। সংবিধানের একাদশ সংশোধনী ১৯৯০ সালের ২ জুলাই গৃহীত হয়।

দ্বাদশ সংশোধনী

সংবিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংশোধনী দ্বাদশ সংশোধনী। এ সংশোধনীর মাধ্যমে দীর্ঘ ১৫ বছরের সামরিক, ছদ্ম সামরিক শাসন হতে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রা শুরু করে। গণভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ এ সংশোধনীকে বৈধতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। জাতীয় সংসদে ১৯৯০ সালের ৬ আগস্ট এ সংশোধনী গ্রহণ করা হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধনী

এই সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদে খ, গ এবং ঘ ধারা সংযোজনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই সংশোধনী মোতাবেক, একজন প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অনধিক ১০ জন উপদেষ্টার দ্বারা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলা হয়। ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ এ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়।

চতুর্দশ সংশোধনী

এই সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে ৪৫টি মহিলা আসন সংরক্ষণ করা হয়। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের সমানুপাতে এসব আসন বণ্টনের বিধান করা হয়। চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে একই সঙ্গে বিচারপতি ও মহা হিসাব নিরীক্ষকের অবসরের সময়সীমা ২ বছর বাড়ানো হয়।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার পর বিগত ৪ দশকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে ১৪টি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। এসব সংশোধনী বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিশীলতার প্রমাণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এ পর্যন্ত সংবিধানে কতটি সংশোধনী হয়েছে?

(ক) ১১টি (খ) ১২টি
(গ) ১৩টি (ঘ) ১৪টি

২। কোন সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে জরুরি অবস্থা জারির বিধান করা হয়?

(ক) প্রথম সংশোধনী (খ) দ্বিতীয় সংশোধনী
(গ) তৃতীয় সংশোধনী (ঘ) চতুর্থ সংশোধনী

৩। কোন সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হয়?

(ক) একাদশ সংশোধনী (খ) দ্বাদশ সংশোধনী
(গ) ত্রয়োদশ সংশোধনী (গ) চতুর্দশ সংশোধনী

৪। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা কোন সংশোধনীর মাধ্যমে চালু হয়?

(ক) একাদশ সংশোধনী (খ) দ্বাদশ সংশোধনী
(গ) ত্রয়োদশ সংশোধনী (গ) চতুর্দশ সংশোধনী

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। সংবিধানের প্রথম পাঁচটি সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

৩। সংবিধানের শেষ পাঁচটি সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (খ), ৩। (খ), ৪। (গ)।